UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ

DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011

আগস্ট ২০১১

August 2011

২৩তম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা

Volume-XXIII, No. VIII

শান্তি বিনির্মাণে সংঘাত নিরসন ও মানবাধিকার : উত্তেজনার মূলোদ্‌ঘাটন

যুদ্ধ ও মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন রোধ এবং এগুলোর ফলশ্রুতিতে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সমাজ পুনরায় গড়ে তোলার জন্য এমন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন যাতে মানবাধিকার প্রবক্তা ও সংঘাত নিরসন চর্চাকারীর প্রেক্ষিত

ইলিন বাবিট

অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্জনের চেয়ে এটা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা সহজ। এ দুটি শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ধারণা নিয়ে চলে, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার ধরনও ভিন্ন। ফলে তাদের মধ্যে পরস্পরের ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রবণতাও দেখা যায়।

অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ের লক্ষ্য হলো যত দ্রুত সম্ভব সহিংসতা, প্রাণহানি ও অন্যান্য দুর্ভোগের অবসান ঘটানো। মানবাধিকার ও সংঘাত নিরসন চর্চাকারী উভয়েরই দীর্ঘমেয়াদে লক্ষ্য হলো সহিংসতার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এবং প্রত্যেক মানুষের অধিকারের প্রতি যাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণে সমাজকে সাহায্যের চেষ্টা করা। কিন্তু তারপরও এসব লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেকে যে পদ্ধতি ব্যবহার করে তা এবং তাদের অন্তর্নিহিত ধ্যান-ধারণা ভিন্ন। ফলে একই সমস্যার ক্ষেত্রে তারা পরস্পরবিরোধী কিংবা পারস্পরিক বর্জনকর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে, সংঘাত নিরসনকারীরা ন্যূনতম প্রাণহানির মধ্য দিয়ে একটি সংঘাতের আলোচনাভিত্তিক যে সমাধান অর্জনে আগ্রহী তা তাদের কাজের দীর্ঘমেয়াদি সফলতা এবং যেসব মুখ্য চরিত্রকে তারা এক সঙ্গে মিলিত করতে চায় তাদের কাছে মানবাধিকারের প্রাসঙ্গিকতায় তেমন গুরুত্ববহ নাও হতে পারে। মানবাধিকার প্রবক্তারা ধিক্কারদান, নেতিবাচক প্রচারণা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচারে দোষী সাব্যস্ত করার মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখার ফলে মানবাধিকার উন্নয়নের সুযোগ হারাতে পারে। যে উন্নয়ন সংঘাত নিরসনকারীদের নির্ভরতার বিষয় আলোচনা ও কূটনৈতিক কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।

এসব ভিন্নতা আরও সুস্পষ্টভাবে খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে সংঘাতের এবং গুচ্ছ কেস স্টাডি সম্পাদনের জন্য আমি প্রয়াত মানবাধিকার সহকর্মী এলেন লুৎজের সঙ্গে কাজ করেছি। এসব কেস স্টাডিতে কলম্বিয়া, সিয়েরা লিয়ন ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে মানবাধিকার ও সংঘাত নিরসনে পেশাজীবীরা ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিটি কেসে দুটি এজেন্ডা কীভাবে এগিয়েছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডে কোনো গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়া অর্জিত হয়েছে কিনা তা দেখা। আমাদের কেস স্টাডির দুটি ঘোরতর উভয় সঙ্কট

বেরিয়ে এসেছে। শান্তি বির্নিমাণ চর্চায় মানবাধিকার ও সংঘাত নিরসনের মধ্যে অধিকতর সমঝোতা ও যৌথক্রিয়া দেখতে চাইলে এ দুটি সঙ্কটের অবসান ঘটাতে হবে। একটি সঙ্কট হলো একটি দেশের ভেতরে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপগুলোর মধ্যে স্থিতিশীল অহিংস সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং এসব গ্রুপের সদস্যদের মানবাধিকারের অপব্যবহার ও যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচারে সোপর্দ করার মধ্যে উত্তেজনা। অপরটি হলো মানবাধিকার ও সংঘাত নিরসন চর্চার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়ক নিয়মনীতির পক্ষে বা সেগুলোকে খর্ব করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কেবল শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই নয় বরং সব পর্যায়ে জবাবদিহিতা বনাম অন্তর্ভুক্তি একটা বড় চ্যালেঞ্জ

শান্তিচুক্তিতে উপনীত হওয়ার পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি হলো পূর্ববর্তী সরকারে যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকারের অপব্যবহারগুলোর ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। মানবাধিকার প্রবক্তারা সংঘটিত অপরাধের জবাবদিহিতা ও আরো অপব্যবহার ঠেকানোর জন্য শান্তি বিধানের ওপর জোর দিলেও সংঘাত নিরসনের প্রবক্তারা চিন্তিত যে, অপরাধের হোতাদের শাস্তি দিলে সমাজে ভাঙন সৃষ্টি হতে পারে, প্রশমন প্রক্রিয়া হতে পারে কষ্টকর।

আমাদের কেস স্টাডিতে চমকপ্রদ যেসব বিষয় দেখা গেছে তার একটি হলো; অপরাধের হোতাদের শাস্তি দেয়া হবে, নাকি পুনর্বাসিত করা হবে তা যে কেবল চুক্তি সম্পাদনের পরেই দেখা যায় তা নয়, বরং সংঘাতের প্রতিটি পর্যায়েই তা উঠে আসে। যে কলম্বিয়ায় সহিংসতা এখনো ঘটছে এবং কোনো চুক্তি এখনো সম্পাদিত হয়নি, সেখানে গেরিলা, বিশেষ করে ফুয়েরজাম আমাদাস রেভ্যুলুসিওনারিয়াস ডি কলম্বিয়ার (এফএআরসি) প্রতি সরকারের সাড়ার মধ্যেই উত্তেজনা ফুটে উঠছে। আমাদের একজন কেস লিপিবদ্ধকারী দাবি করেছেন যে, এফএআরসি নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ও মর্যাদার জন্য আকুলতা থাকলেও তারা দেখতে পাচ্ছে যে, উদারপন্থি ও রক্ষণশীলদের কারণে যে সরকার থেকে বংশপরম্পরায় তারা দূরে পড়ে রয়েছে,

তাতে অংশগ্রহণের একমাত্র পথ সহিংসতা। অবশ্য বছরের পর বছর পরিক্রমায় এসব গেরিলাই নিজেদের টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে যুদ্ধাপরাধ ও মাদক পাচারের মতো অবৈধ কর্মকাণ্ডে ঝুঁকে পড়েছে। এটা সত্যিকার একটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে :

(সংঘাত নিরসনের দৃষ্টিকোণ থেকে) পার্থক্য নিরসনের একমাত্র উপায় হলো সহিংসতাবিরোধী রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গেরিলাদের বৈধ স্বার্থকে স্বীকৃতি দেয়া (আর মানবাধিকারের দিক থেকে), মাদক পাচার ও অপহরণের জন্য অপরাধীদের বিচার করার মাধ্যমে আইনের শাসন জোরদার করা।

দুই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গতিপূর্ণ করার উপায় কী?

সিয়েরা লিয়নে শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনাকালে বিদ্রোহী গ্রুপ বিপ্লবী যুক্তফ্রন্টের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা ফোডোয় মানকোহকে সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি কঠিন প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। এটা এমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, শান্তি চুক্তির পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে উপদলীয় নেতাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান প্রাতিষ্ঠানিক নীতি হিসেবে সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের সমর্থন স্থগিত করতে বাধ্য হন। এ ধরনের নেতার বিরুদ্ধে মহাসচিব অবরোধের উদ্যোগ না নিলেও সাধারণ ক্ষমার প্রতি জাতিসংঘের অনুমোদন স্থগিত করার মধ্য দিয়ে এই সঙ্কেত বার্তা দেয়া হয় যে, জাতিসংঘ এ ধরনের কোনো চুক্তির পক্ষ হতে চাইছে না। সিয়েরা লিয়ন নিয়ে আলোচনার পর আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) কার্যক্রম শুরু করায় যুদ্ধাপরাধের দায়ে নেতৃবৃন্দের বিচার করা সম্ভব হচ্ছে। একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিনিময়ে নেতৃবৃন্দের পূর্ণ ক্ষমা দাবি করতে পারার সম্ভাবনাও এতে কমে গেছে। ভবিষ্যৎ শান্তি আলোচনার ওপর আইসিসির অভিঘাত কী হয় তা অবশ্য দেখার ব্যাপার। উদাহরণ হিসেবে, এই লেখা তৈরির সময় উগান্ডার উত্তরাঞ্চলে লর্ডস প্রতিরোধ সেনাদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে আইসিসির তদন্ত সেখানে শান্তি আলোচনার সমাপ্তিকে ব্যাহত করেছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে গুড ফ্রাইডে চুক্তিতে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণে মানবাধিকারের একটি জোরালো বিষয় থাকলেও ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে গোলমাল যখন শুরু হয় তখনকার সহিংসতার মূল কারণ ওই অঞ্চলের ক্যাথলিকদের প্রতি অতীতের বৈষম্যমূলক কাজকর্মের স্বীকৃতির ব্যাপারে কোনো কথা নেই। আমাদের কেস লিপিবদ্ধকারীরা উল্লেখ করেছেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হয়েছে বৈষম্যের ওপর এবং এখনো গুড ফ্রাইডে চুক্তির মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলো 'বাস্তবায়নাধীন' রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে বছরের পর বছর পরিক্রমায় মানবাধিকার থেকে ক্ষমতার ভাগাভাগির দিকে গুরুত্ব সরে গেছে। কেউ

যুক্তি দেখাতে পারেন যে, সংঘাতের মূল বিষয়টি নিয়ে বহুলাংশে এখনো আলোচনা এবং তার সমাধান হয়নি বলে সামান্য সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে এবং চুক্তির বাস্তবায়নও হয়েছে ক্ষীণ।

এসব কথায় কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই, বরং এই চিত্র তুলে ধরে যে, বাস্তব বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভারসাম্য বিধান কতোটা জটিল। উদাহরণ হিসেবে, এমন কোনো প্রণালিবদ্ধ বিশ্লেষণ চালানো হয়নি যে, যার ভিত্তিতে সাধারণ ক্ষমা আইনের শাসনকে খর্ব করে নাকি শান্তি চুক্তিকে অস্থিতিশীল করে তা নির্ণয় করা যেতে পারে।

মানবাধিকার ও সংঘাত নিরসন চর্চা প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি সহযোগিতামূলক তা নির্ণয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

উপরে যে তিনটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার সবক'টিতেই মানবাধিকার ও সংঘাত নিরসন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বাইরের কুশীলবদের একটা বিরাট অভিঘাত ছিল। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ তাদের নীতি ও আচরণের মাধ্যমে মাত্রা ঠিক করে দেয়। সিয়েরা লিয়নে জাতিসংঘ ছিল বাইরের প্রধান কুশীলব। শান্তি চুক্তির ধারাগুলো ট্রুথ কমিশনের কাঠামো ও সে দেশে সক্রিয় মানবাধিকার সংক্রান্ত অনেক বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কার্যক্রম সমন্বয়ে পরামর্শদানের জন্য একটি শক্তিশালী মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ দল নিয়োজিত করে বিশ্ব সংস্থা। এমনকি সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ মহাসচিবের সিয়েরা লিয়নবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আন্তর্জাতিক সাধারণ ক্ষমার বিরুদ্ধে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন। চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর সহিংসতার বিস্তার ঘটলে হোতাদের বিচারের জন্য জাতিসংঘ একটি ট্রাইব্যুনাল গঠনেও সহায়তা করে। সিয়েরা লিয়নে সংঘাত নিরসন ও মানবাধিকার প্রবক্তাদের মধ্যে জাতিসংঘের উৎসাহ ও সমর্থনে যে সহযোগিতা হয়েছিল তা অন্যান্য দেশের জন্য কার্যক্রম পরিকল্পনার একটা অনুকূল আদর্শ হতে পারে।

আমাদের কেসগুলো থেকে দেখা যায় যে, কলম্বিয়া কিংবা উত্তর আয়ারল্যান্ডে এ ধরনের সহযোগিতা হয়নি। কলম্বিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তায় গেরিলা আন্দোলনের প্রতি সরকার একটি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য হলো তাদের পরাজিত ও মাদক ব্যবসা ধ্বংস করা। কিন্তু কোনো উদ্দেশ্যই অর্জন হয়নি। এনজিও এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও শান্তি প্রক্রিয়া সে তুলনায় বাইরের সমর্থন পায়নি। মনে হয় যে, আন্তর্জাতিক বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্টতা পরিস্থিতিকে, বিশেষত মানবাধিকার বা সংঘাত নিরসনে সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভালো করার পরিবর্তে আরো খারাপ করে ফেলেছে।

কিছুটা হলেও উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্ষেত্রে একই কথা বলা যায়। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের উদ্যোগে পরিচালিত শান্তি প্রক্রিয়া অনিবার্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত দুটি উপজাতির ধারণাকে জোরদার করেছে বলে আমাদের কেস লিপিবদ্ধকারীরা মনে করেন। ১৯৯৮ সালের গুড ফ্রাইডে চুক্তিতে বর্ণিত ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থা এই বিভক্তিকে আরো সংহত করেছে। একই সঙ্গে গোলযোগ শুরু হওয়ার অনেক আগে সেখানকার বৈষম্য ও মানবাধিকারের অপব্যবহারগুলো মোকাবিলা করার ইচ্ছা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের থাকলে তিরিশ বছরব্যাপী সহিংসতাকে হয়তো পরিহার করা যেতো। এখনো সংঘাতের মূলে মানবাধিকারের বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি হয়নি এবং স্বল্প পর্যায়ের সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে মানবাধিকার এবং সংঘাত নিরসনের এজেন্ডাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তাই ক্ষমতার চরম অপ্রতিসাম্যের ক্ষেত্রে শান্তি বিনির্মাণে সংঘাত নিরসন প্রয়াসে মানবাধিকারের নিয়মনীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করার একটা দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রয়েছে। মানবাধিকারের নিয়মনীতিগুলো দুটি

গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে এসব অপ্রতিসাম্যের নিরসন ঘটায়। প্রথমে এসব নিয়মনীতি দুর্বল পক্ষের ক্ষমতায়নে সহায়তা করে—যাকে সংঘাত নিরসন সম্প্রদায় ইতোমধ্যেই অনুমোদন করছে। মানবাধিকারের অগ্রগণ্য নিয়মনীতিগুলো জোরদার করার মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষীয় সংঘাত নিরসন প্রক্রিয়া একটি অধিক ন্যায়সঙ্গত সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে আলোচনা করার জন্য দুর্বল পক্ষকে সমর্থন দিলে অধিকতর ফলপ্রসূতা অর্জন হতে পারে। দ্বিতীয়টি হলো, মানবাধিকার নিয়মনীতি এই ধারণা জোরদার করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তার সীমান্তের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব বহন করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, রাষ্ট্র অভ্যন্তরে সংঘাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘাত নিরসন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন যারা করেন তারা এমন ধারণা করছে পারেন না যে, মানবাধিকার 'আমাদের বিষয় নয়'। এগুলো পক্ষগুলোর স্বার্থ ও উদ্বেগের মূল বিষয়, ক্ষমতার অপ্রতিসাম্য ও কখনো কখনো ক্ষমতা অপব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে সংঘাতের নিষ্পত্তি বা রূপান্তর করার চেষ্টা চালাই এই অপ্রতিসাম্য ও অপব্যবহার তার কারণ ও পরিণতি। মানবাধিকারের নিয়মনীতিগুলোর শক্তি ও দুর্বলতা এবং এসব নিয়মনীতি গঠনমূলক ও যথোপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার করতে জানা ও অনুধাবন করা শান্তি বিনির্মাণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম :

ইউনিক ইনটার্ন নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু

২৮ আগস্ট, ২০১১

জাতিসংঘ বিষয়ক জ্ঞান বিনিময়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র কর্তৃক 'বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষানবিশদের নিয়ে গঠিত 'ইউনিক ইন্টার্স নেটওয়ার্ক'-এর কার্যক্রম গত ২৮ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ২৫ জন প্রাক্তন ইনটার্ন এতে অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা নেটওয়ার্কটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং একে একটি কার্যকরী মঞ্চে পরিণত করার জন্য ইনটার্নদের প্রতি আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে তথ্যকেন্দ্রের নলেজ ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান নেটওয়ার্কটির কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে : ফেসবুকের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান, ইউনিক নিউজলেটারসহ অন্যান্য তথ্য উপকরণ বিতরণ, যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে ইনটার্নদের অংশগ্রহণ এবং প্রতি ছয় মাস পরপর সভা/কর্মশালার আয়োজন করা। প্রাক্তন ইনটার্নরা নেটওয়ার্কটিকে কার্যকরী করতে তাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণকারী ইনটার্ন ও স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ

ইনটার্নের গ্রুপ ছবি

গ্লোবাল মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনস (জিমুন) অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

২৮ আগস্ট, ২০১১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও জাতিসংঘ যুব ও ছাত্র সমিতি (ইউনিস্যাব) যৌথভাবে ২৮ আগস্ট ২০১১ তথ্য কেন্দ্রের সভাকক্ষে জিমুন-এর অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত এক সভার আয়োজন করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচন শহরে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল মডেল ইউনাইটেড ন্যাশনসে (জিমুন) অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজন উক্ত অনুষ্ঠানে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। জিমুন-এর প্রক্রিয়া ও ফলাফল নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং আগামী বছরের কোনো এক সময় ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় একটি আঞ্চলিক মুন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইউনিক অধিকর্তা কাজী আলী রেজা সভাটি পরিচালনা করেন। সভার শুরুতেই 'দ্য ইউনাইটেড ন্যাশনস—ইটস ইউর ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

গ্লোবাল মুন-এ অংশগ্রহণকারীদের একজন তার অভিজ্ঞতা বিনিময় করছেন

সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করছেন

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম :

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০১১

লালবাগ দুর্গ এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

১২ আগস্ট, ২০১১

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ইউএনভি এবং কয়েকটি সহযোগী সংগঠন (আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স, ঢাকাবাসী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুন অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ, ন্যাশনাল ইয়ুথ কাউন্সিল, হোপ ৮৭, ভিএসও, ইউনিস্যাব, নটর ডেম কলেজ রোটার্যাক্ট ক্লাব ও ডিসিসি (৬১ নম্বর ওয়ার্ড), ১২ আগস্ট ২০১১ লালবাগ দুর্গ ও এর আশপাশের এলাকায় এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করে।

স্থানীয় সংসদ সদস্য ড. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউএনডিপির কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন প্রিজনার। এছাড়া যুব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আজিজুর রহমান, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা, ইউএনভির জাতীয় সমন্বয়ক রমণী মোহন চাকমা এবং স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার হাজী আলতাফ হোসাইন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন।

জাতিসংঘ কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবকসহ ১০০ জনেরও বেশি লোক অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা আগামীদিনগুলোতে কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিতে তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।’

প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন তাঁর বাঁয়ে ইউএনডিপি কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন প্রিজনার

স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা

স্বেচ্ছাসেবীরা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন

অংশগ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ করছেন

জাতিসংঘে নিরোধ কূটনীতি

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে মহাসচিব ড্যাগ হ্যামারশোল্ডের মুখে প্রথম উচ্চারিত হওয়ার পর থেকে নিরোধ কূটনীতির ধারণাটি জাতিসংঘ জুড়ে রয়েছে। জাতিসংঘ সনদের অনুচ্ছেদ ৯৯ নিরোধ কূটনীতির আভাস দিয়ে রেখেছে, যাতে

বারন্ট্রান্ড জি. রামচরণ

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকির বিষয়গুলো নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিতে আনার সুযোগ মহাসচিবের রয়েছে। জাতিসংঘের শুরু থেকেই মহাসচিব ট্রিগবি লাই পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে দেখার জন্য দূত পাঠানো এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ সৃষ্টির মতো সঙ্কট চলতে না দেয়া বা প্রশমনের লক্ষ্যে যা করা দরকার তা করার জন্য এই অনুচ্ছেদের আওতায় দেয়া সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন।

> মহাসচিব বান কি-মুন বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে যে সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে নিরোধ কূটনীতির শ্রেণীতে ফেলা যায়

মহাসচিব ড্যাগ হ্যামারশোল্ড জানতেন যে, স্নায়ুযুদ্ধের সময় পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সরাসরি যেখানে বিরোধ, সেখানে জাতিসংঘ করতে পারে অতি সামান্য। তবে তাঁর মনে এ কথা ছিল যে, সুযোগ নিজে থেকেই উপস্থিত হলে তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দেশগুলোর বিরোধ থামাতে এবং তার মধ্যে পরাশক্তিগুলোর প্রতিযোগিতাকে টেনে আনা তিনি রোধ করতে পারবেন। হ্যামারশোল্ড নিরোধ কূটনীতির নির্দেশকগুলোর চর্চা শুরু করেন এবং যা এখনো বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁর প্রচেষ্টা কাজে লাগবে কিনা তা তিনিই স্থির করতেন। বরাবরই বিচার-বিশ্লেষণের ব্যবস্থা ছিল : তাঁর সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিষয়ে আপনাআপনি কিছু ছিল না। তিনি

প্রতিনিধি ব্যবহার করতেন, যাদের তিনি বিশেষ মিশনে পাঠাতেন বা বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়োগ করতেন। তিনি বিশ্বজুড়ে প্রতিনিধির একটি বেষ্টনী গড়ে তুলবেন বলে ভেবেছিলেন।

মহাসচিব উ থান্ট হ্যামারশোলডের স্বপ্ন এগিয়ে নিয়ে যান। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট নিয়ে একটি পারমাণবিক সংঘাত রোধে তাঁর যে ভূমিকা তা জাতিসংঘের কালপঞ্জিতে নিরোধ কূটনীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হবেই। জাতিসংঘের মহাফেজখানায় তাঁর প্রচেষ্টা বিষয়ক নাটকীয় উপাদানগুলো রয়েছে। এ বিষয়ে আমি পরে আসছি।

মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম নিরোধ কূটনীতির এই চর্চা অব্যাহত রাখেন। তাঁর সফলতাগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৬০-এর দশকে ইরান-ইরাকের সীমান্ত বিরোধ। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইলি যুদ্ধের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিনি সনির্বন্ধ আবেদন জানান। এই পরিস্থিতি রোধ ও নিয়ন্ত্রণে তিনি দ্রুত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী পাঠান এবং এ প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসিত হন।

মহাসচিব হেভিয়ার পেরেজ ডি কুইয়ার ১৯৮৯ সালে বুলগেরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধের অবনতি রোধে দুটি দেশে একটি বিচক্ষণ তথ্যানুসন্ধানী মিশন পাঠানোর কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেন। মানব নিরাপত্তা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে হুমকির ওপর ব্যাপক বৈশ্বিক সতর্ক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করেন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বা তা ভঙ্গ হতে পারে এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে সতর্ক করতে মহাসচিবকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মহাসচিবের দপ্তরে তিনি একটি ইউনিট স্থাপন করেন।

স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই যখন নতুন এক বিশ্ব ব্যবস্থার আশা দেখা দেয় তখন মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ বৈঠকে সংঘাত রোধ, শান্তি স্থাপন ও শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁকে একটি রিপোর্ট দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্যাপক প্রশংসিত শান্তির এজেন্ডা পেশ করেন। বুট্রোস ঘালি ইরিত্রিয়া ও ইয়েমেনের মধ্যে যুদ্ধের মতো ক্ষেত্রগুলোতে নিরোধ কূটনীতি চর্চা করেন এবং সাবেক যুগোস্লাভ প্রজাতন্ত্র মেসিডোনিয়ায় প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের নিরোধ মোতায়েন প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেন।

মহাসচিব কফি আনান তাঁর পূর্বসূরিদের কাজ আরো এগিয়ে নেন এবং এ বিষয়ে তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি ক্যামেরুন ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বাকাসি উপদ্বীপ নিয়ে সীমান্ত সংঘাতে সফলভাবে নিরোধ কূটনীতি কাজে লাগান।

বর্তমান মহাসচিব বান কি-মুন

জাতিসংঘ নিরোধ কূটনীতির চর্চা এগিয়ে নিয়েছেন এবং বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে যে সাহসী নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে নিরোধ কূটনীতির শ্রেণীতে ফেলা যাবে। তিনি নিরোধ কূটনীতির ওপর সাধারণ পরিষদে রিপোর্টও দিয়েছেন।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটকালে উ থান্টের নিরোধ কূটনীতি

ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেন যে, মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বিপজ্জনক সময় ছিল কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কট, সে সময়ে ১৯৬২ সালের ১৬ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ১৩ দিন সময়ে বিশ্ব নিজেকে উড়িয়ে দেয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ঘোষণা করেছিলেন যে, ২৪ অক্টোবর থেকে কিউবার চারদিকে তিনি নৌ অবরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আমেরিকান ও সোভিয়েত নৌ জাহাজগুলো পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং এসব জানা গেছে যে, একজন সোভিয়েত ক্যাপ্টেনকে সোভিয়েত জাহাজ রক্ষা বা আত্মরক্ষার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এই সঙ্কট প্রশমনে জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টের প্রচেষ্টা যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। ১৯৬২ সালের ২৪ অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া ভাষণে উ থান্ট জোর দিয়ে বলেন যে, যা বিপন্ন তা হলো মানবজাতির ভাগ্য। তিনি সরাসরি জড়িত পক্ষগুলোর মধ্যে জরুরি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং নিরাপত্তা পরিষদকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী নিকিটা ক্রুশ্চেভের কাছে তিনি দুই থেকে তিন সপ্তাহ বিলম্বনের জরুরি আবেদন পাঠিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এটা হবে কিউবায় স্বেচ্ছায় সবধরনের অস্ত্র পাঠানো স্থগিত করা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হবে স্বেচ্ছায় অবরোধ তুলে নেয়া, বিশেষ করে কিউবাগামী সব জাহাজে তল্লাশি চালানো বন্ধ রাখা। তিনি আলোচনা চলাকালে কিউবায় বড় ধরনের সামরিক সুবিধা, স্থাপনা নির্মাণ ও গড়ে তোলা বন্ধ রাখার জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও কিউবার প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। যে কোনো কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো তাঁকে পাবে বলেও তিনি প্রস্তাব দেন।

১৯৬২ সালের ২৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ উ থান্টকে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে চিঠি দেন। কেনেডিও একই দিন চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি কিউবা থেকে অস্ত্র সরিয়ে নেয়ার মধ্যে সঙ্কট সমাধানের যে চাবিকাঠি রয়েছে তা উ থান্টের বার্তার নিহিতার্থ হওয়ায় তিনি তার প্রশংসা করেন। সোভিয়েত জাহাজগুলো অবরোধ করে রাখা সমুদ্র এলাকা অভিমুখে এগোতে থাকে। সেদিনই উ থান্ট দুই নেতার কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠান। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, ইতোমধ্যে কিউবা অভিমুখী সোভিয়েত জাহাজগুলো অবরোধকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যা সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজের মধ্যে সংঘাত ঘটাতে পারে। ফলে আলোচনার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে ইতোমধ্যেই কিউবার উদ্দেশে কোনো জাহাজ যাত্রা করে থাকলে সীমিত সময়ের জন্য তাকে অভিগ্রহণ এলাকা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়ার অনুরোধ জানান। আর প্রেসিডেন্ট কেনেডিকেও তিনি সোভিয়েত জাহাজের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত পরিহারের জন্য ক্যারিবিয়ায় মার্কিন জাহাজগুলোকে যা কিছু করার নির্দেশদানেরও অনুরোধ জানান। প্রত্যেককে তিনি জানান যে, তাঁর চাওয়া আশ্বাস পাওয়া গেলে তিনি তা অপরপক্ষকে জানিয়ে দেবেন।

সোভিয়েত সরকারের গ্রহণ করা সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাৎক্ষণিকভাবে উ থান্টের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভও বিলম্বন মেনে নেন। উ থান্টকে তিনি জানান যে, কিউবা অভিমুখী সোভিয়েত জাহাজগুলোকে সাময়িকভাবে অভিগ্রহণ এলাকার বাইরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে উ থান্ট তাঁর আবেদনের উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়ার কথা জানিয়ে কিউবায় বড় ধরনের সামরিক স্থাপনা, বিশেষ করে মাঝারি ও মধ্যম পাল্লায় দূরবেধী ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের মতো স্থাপনার নির্মাণ কাজ আলোচনা চলাকালে স্থগিত রাখার অনুমতি জানান।

আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উ থান্টের আবেদন মেনে নেয়ার পর এবং সেই সঙ্কটকালে পত্র ও বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মধ্যে বিনিময়ের ফলে তিনি যা পেয়ে এমন একটি মতৈক্যে পৌঁছাতে পেরেছেন, যে সূত্র পরিশেষে ক্ষেপণাস্ত্র সঙ্কটের অবসান ঘটিয়েছে। কিউবার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য উ থান্ট ১৯৬২ সালের ৩০ ও ৩১ অক্টোবর কিউবা সফর করেন। তাঁর এই সফর এমনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তা কিউবান নেতৃবৃন্দকে উত্তেজনা প্রশমনের একটা সুযোগ প্রদান করে।

মতৈক্য যখন সংহত হচ্ছিল, তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬২ সালের ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে লিখিত তাঁর চিঠিতে বলেন: 'কার্যকরী মহাসচিব উ থান্টের বিশেষ প্রচেষ্টা আমাদের উভয়ের কাজকে যথেষ্ট সুগম করেছে।' বিস্তারিত সবকিছুর নিষ্পত্তি এবং সঙ্কট কেটে যাওয়ার পর আমেরিকান ও সোভিয়েত আলোচকরা এক যৌথ চিঠিতে উ থান্টকে বলেন, 'আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ক্যারিবীয় এলাকায় উদ্ভূত শক্তির প্রতি গুরুতর হুমকি পরিহারে আমাদের সরকারদ্বয়কে সহায়তাদানে আপনার প্রচেষ্টার জন্য আপনার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন করতে চাইছি।'

১৯৮৭ সালে মহাসচিব পেরেজ ডি কুইয়ার বলেছেন যে, মানব নিরাপত্তার প্রতি হুমকির ওপর জাতিসংঘ ব্যবস্থার একটা ব্যাপক বৈশ্বিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এই ধরনের মূল্য বহাল থাকে এবং তা পুনরায় চালু করতে হবে। পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মতো বিশ্বের কোনো কোনো অংশে জাতিসংঘের আঞ্চলিক সংঘাত রোধ কেন্দ্র রয়েছে। এ ধরনের আরো বেশি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে একটি বলিষ্ঠ নীতি। আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সংঘাত রোধ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্ধিত সহযোগিতা হবে অর্থবহ। নিরোধ কাজ করার জন্য রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের জনশক্তি বৃদ্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ।

জাতিসংঘ মানবাকািার বিষয়ক হাইকমিশনার এবং সুরক্ষা ও গণহত্যা রোধ বিষয়ক উপদেষ্টাদের অগ্রাধিকারভিত্তিক দায়িত্ব নির্ধারণকালে মহাসচিবকে দেশ পর্যায়ে গণতন্ত্রের কূটনীতি ও মানবাধিকারে লালন করতে হবে। এটা সংঘাত রোধে সহায়ক হবে।

নারীর ক্ষমতায়নের মতো অতিদারিদ্র্য মোচন জরুরি। এটা যেমন কৌশলের বিষয়, তেমনি ন্যায়বিচারেরও। মানব মর্যাদা বৃদ্ধি সফল নিরোধের চাবিকাঠি।

নিরোধ কূটনীতি জাতিসংঘের অন্যতম মহান ধারণা, যা যতোদিন জাতিসংঘ বিদ্যমান থাকবে, ততোদিনই তাকে ঘিরে থাকবে; কারণ এর পেছনে সহজ একটি বিশ্বাস রয়েছে যে, সঙ্কট বা সংঘাত রোধে যা কিছুই করা হোক না কেন, তাকে বিবেচনা করতে হবে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ফ্যাক্স : ৮১২৯০৪৭ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 811 86 00 Fax: 8129047 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org